ভাষাতত্ত্ব

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

বাংলা ভাষা উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। এই ভাষাগুলিকে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে কয়েকটি ভাষাবংশে বর্গীকৃত করা হয়। এর মধ্যে একটি ভাষাবংশ হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের লোকেদের আদি বাসস্থান ছিল রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে। সেখান থেকে আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্তারের ফলে তাদের ভাষায় ক্রমশ আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে প্রথমে পাঁচটি প্রাচীন ভাষার জন্ম হয়। এর মধ্যে একটি হল ইন্দো-ইরানীয় ভাষা বংশ।

ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষীর জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেরা 'আর্য' নামে অভিহিত করত বলে সংকীর্ণ অর্থে এই শাখাটিকে আর্যশাখা বলা হয়। এই আর্যভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব। তবে আর্য থেকে বিবর্তণের পরবর্তী ধাপেই বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেনি— বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় আর্যভাষাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা— কালসীমা ১৫০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ।
২) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা— কালসীমা ৬০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ। এবং
৩) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা— কালসীমা ৯০০ খ্রিস্টাবদ থেকে বর্তমান সময়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দু'টি রূপ ছিল— সাহিত্যিক ও কথ্য। কথ্যরূপটির চারটি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল— প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিনাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তণ লাভ করে যখন প্রাকৃত ভাষার রূপ নেয় তখন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ সূচিত হয়। প্রাকৃতের প্রথম স্তরে তার চারটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ভারতীয় আর্যের কথ্যরূপগুলি থেকে চারটি প্রাকৃত উপভাষার জন্ম হয়। যেমন প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা প্রাকৃত এবং প্রাচ্য-মধ্যা প্রাকৃত, উদীচ্য থেকে উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত এবং মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃত। এরপর প্রাকৃত ভাষা যখন বিবর্তণের দ্বিতীয় স্তরে পড়ে তখন মূলত এই চার রকমের মৌখিক প্রাকৃত থেকে পাঁচ রকমের সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হয়। যেমন— উত্তর-পশ্চিমা থেকে পৈশাচী, পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী, প্রাচ্য মধ্যা থেকে অর্ধ মাগধী এবং প্রাচ্যা থেকে মাগধী।

পৈশাচী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী এবং মাগধী ছিল শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত। প্রাকৃতের বিবর্তণের তৃতীয় স্তরে এইসব সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তি স্থানীয় কথ্যরূপগুলি থেকে অপভ্রংশের জন্ম হয় এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে আসে অবহট্‌ঠ। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত থেকে সেই শ্রেণীর অপভ্রংশ-আবহট্‌ঠের জন্ম হয়েছিল। যেমন পৈশাচী প্রাকৃত থেকে পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ এবং মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ।

এরপর ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয়যুগে পদার্পন করে। এই সময় এক একটি অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্মলাভ করে। যেমন— পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহঠট্‌ থেকে পাঞ্জাবি, মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে মারাঠি, শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে হিন্দি, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে অবধি, আর মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ পশ্চিমা ও পূর্বী নামে দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরমধ্যে পূর্বী ভাষাটি থেকে বঙ্গ-অসমীয়া এবং ওড়িয়া এই দু'টি ভাষার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গ-অসমীয়া ভাষাটি বিভক্ত হয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে।

এভাবে বিবর্তনের নানা স্তর পেরিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে। অনেকেই বাংলা ভাষার জননী হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকে বললেও তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারন সংস্কৃত ছিল আর্যভাষার লিখিত রূপ, আর বাংলা ভাষার উদ্ভব আর্যভাষার কথ্যরূপ (প্রাকৃত) থেকে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। এদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধ্যণত তূলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে কয়েকটি ভাষাবংশে বর্গীকৃত করা হয়। এই ভাষাবংশের একটি শাখা ভারতবর্ষ ও ইরান-পারস্যে প্রবেশ করলে তাদের ইন্দো-ইরানীয় বা সংকীর্ণ অর্থে আর্য শাখা বলা হয়। এই শাখাটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি যায় ইরান-পারস্যে, অপরটি আসে ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে যে শাখাটি প্রবেশ করে তাদের ভাষাকেই ভারতীয় আর্যভাষা বলে। ঘটনাটি ঘটেছিল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় আর্যভাষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়—

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা— বিস্তারকাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

২) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা— বিস্তারকাল আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ এবং

৩) নব্যভারতীয় আর্যভাষা— বিস্তারকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার বিস্তারকাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই ভাষার মূল নিদর্শন হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'। 'বেদ' আবার চারটি ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। এছাড়াও প্রত্যেক বেদের আবার চারটি অংশ আছে— সংহিতা, ব্রাহ্মন, উপনিষদ এবং আরণ্যক। প্রাচীনভারতীয় আর্যের দু'টি রূপ ছিল— বৈদিক ও সংস্কৃত। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং শ, ষ, স সহ সমস্ত ব্যঞ্জণধ্বনি এই ভাষায় প্রচলিত ছিল।

২) স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনির বিশেষ ক্রম আনুসারে পরিবর্তন হত। এই পরিবর্তনের তিনটি ক্রম ছিল— গুন, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারন। স্বরধ্বনি অবিকৃত থাকলে তাকে গুন বলে, স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে গেলে তাকে বৃদ্ধি বলে এবং স্বরধ্বনি যখন ক্ষীণ হয়ে লোপ পায় তখন এই পরিবর্তনকে সম্প্রসারন বলে।

৩) সন্নিহিত দুই ধ্বনির মধ্যে যেখানে সন্ধি সম্ভব সেখানে সন্ধি প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল।

৪) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বৈদিক ভাষার স্বর তিন প্রকার ছিল— উদাত্ত (high\acute), অনুদাত্ত (low\grave), এবং স্বরিত (circumplex)।

৫) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে যুক্ত ব্যঞ্জণের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন— ক্র, ক্ল, ক্ত, ক্ত্র, র্ম, র্দ্ধ, ষ্ট্র, ঘ্ন ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন নিয়ে প্রাচীনভারতীয় আর্যে তিনটি বচন ছিল।

২) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রাচীনভারতীয় আর্যে আটটি কারক ছিল— কতৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, নিমিত্তকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক, সম্বন্ধকারক, অধিকরণকারক এবং সম্বোধনকারক।

৩) প্রাচীনভারতীয় আর্যে লিঙ্গ তিনপ্রকার ছিল— পুং লিঙ্গ (masculine), স্ত্রীলিঙ্গ (feminine) এবং ক্লীবলিঙ্গ (neuter)।

৪) প্রাচীনভারতীয় আর্যে শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য বেশি ছিল। কর্তৃবাচ্য (Active Voice) কর্ম-ভাব বাচ্য (Middle Voice)— এই দুই বাচ্যে ক্রিয়ারূপ পৃথক হত।

৫) ক্রিয়ারূপ পরৈস্মপদ ও আত্মনেপদ— এই দুইরূপে বিভক্ত ছিল। ধাতুও তিনভাগে বিভক্ত ছিল— পরৈস্মপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

৬) প্রাচীনভারতীয় আর্যে তিনপুরুষে (উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ) ক্রিয়ারূপ পৃথক হত।

৭) এই ভাষায় ক্রিয়ার পাঁচটি কাল ছিল। এগুলি হল— লট্, লঙ্, লৃট্ (Present Perfect, Future), লিট্ (Perfect) লুঙ্ (Past)। এর মধ্যে লঙ্, লুঙ্ ও লিট্ ছিল অতীত কালের ই প্রকারভেদ।

৮) প্রাচীনভারতীয় আর্যের বৈদিকে ক্রিয়ার পাঁচটি ভাগ ছিল— অভিপ্রায় (লেট্), নির্বন্ধ, নির্দেশক, সম্ভাবক (বিধিলিঙ্) এবং অনুজ্ঞা (লোট্)।

৯) প্রাচীনভারতীয় আর্যে প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, পরি, অপি, অপ, আ— এই কুড়িটি উপসর্গ ছিল। যারা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করত।

১০) প্রাচীনভারতীয় আর্যে প্রত্যয় যোগেও নতুন নতুন শব্দ গঠন করা হত। এই প্রত্যয় ছিল দুই প্রকার— কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। (ধাতুর সাথে যে প্রত্যয় যোগ করা হত তাকে বলা হত কৃৎ প্রত্যয়। যেমন— বৃৎ+শানচ্= বর্তমান, মন+উ= মনু, আর শব্দের সাথে যে প্রত্যয় যোগ করআ হত তাকে বলা হত তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন— মন+অন্= মানব।)।

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য:

প্রাচীনভারতীয় আর্যে কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারক ও ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের বিভক্তি সুনির্দিষ্ট ছিল জন্য বাক্যের মধ্যে সেগুলি যেখানেই বসুক কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতি সহজে চিনে নেওয়া যেত। ফলে বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অবস্থান উল্টে পাল্টে দিলেও তাতে বাক্যের অর্থ বিঘ্নিত হত না।

ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য:

প্রাচীনভারতীয় আর্যের বৈদিকের ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক— অক্ষরের সংখ্যা লঘুগুরু বিচার করে এখানে ছন্দ নির্ণয় করা হত। পরবর্তীকালের মাত্রামূলক ছন্দের সাথে এই ছন্দের পার্থক্য এখানে যে, মাত্রামূলক ছন্দ পদ্ধতিতে অক্ষর উচ্চারণের কাল বা মাত্রা অনুযায়ী ছন্দ নির্ণয় করা হত।

মধ্যভারীয় আর্যভাষা

পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত ভাষাকে যে কয়েকটি ভাষাবংশে বিভক্ত করা হয় তার মধ্যে একটি হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি শাখা হল ইন্দো-ইরানীয় শাখা, যাকে সংকীর্ণ অর্থে আর্য শাখা বলা হয়। এই আর্য শাখার একটি দল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলে ভারতীয় আর্যভাষার যুগের সূচনা ঘটে। সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত প্রচলিত এই আর্যভাষাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—

১) প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা— কালসীমা ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ।

২) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা— কালসীমা ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ এবং

৩) নব্যভারতীয় আর্যভাষা— কালসীমা ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল।

প্রাচীনভারতীয় আর্যের লিখিত ভাষা ছিল বৈদিক ও সংস্কৃত। কিন্তু এ সময়কার মুখের ভাষা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই ধ্বনিগত তথা ব্যকরণগত স্বরূপের পরিবর্তন ঘটে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই যুগটির নাম দেওয়া হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। এই ভাষা ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই সময়কার ভাষাগুলি হল— ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত, বৌদ্ধ সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ঠ প্রভৃতি। স্বাভাবিকভাবে ১৫০০ বছরে এর মধ্যেও নানা পরিবর্তণ এসেছে। আমরা সেই বিভাগের আলোচনায় না গিয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারন বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

এই মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার দু'টি অর্ধ-ব্যঞ্জণধ্বনি 'ঋ' ও 'ঌ' মধ্যভারতীয় আর্যে লোপ পায়। 'ঌ' একেবারে লোপ পায়, আর 'ঋ' এক এক প্রাকৃতে এক এক রকম ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন মগ<মৃগ, বুড্ঢ<বৃদ্ধ, ইসি<ঋষি।

২) 'ঐ' এবং 'ঔ'-এই দু'টি যৌগিকস্বর একক স্বর 'এ' এবং 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন— ধর্মানুশত্থিয়ে<ধর্মানুশস্তৈ (এ<ঐ), ওষধানি<ঔষধানি (ও<ঔ)।

৩) 'অয়' এবং 'অব' সংকোচনের ফলে 'এ' এবং 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন- পূজেতি<পূজয়তি, ভোদি<ভবতি।

৪) পদান্তেস্থিত অনুস্বারের পূর্ববর্তী এবং যুক্তব্যঞ্জণের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিবর্তিত হয়। যেমন— কন্তং<কান্তাম্।

৫) পদের শেষে অবস্থিত অনুস্বার সাধারণত রক্ষিত হয়েছে। যেমন— নরং<নরাম্, এছাড়াও বাঁকি সব ব্যঞ্জণধ্বনি লোপ পেয়েছে। যেমন— নরা<নরাৎ।

৬) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয়স্তরে দুইস্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জণ অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেয়েছে এবং তার জায়গায় কখনো য়-শ্রুতি, কখনো ব-শ্রুতি হয়েছে। যেমন সয়ল<সঅল<সকল। আর মহাপ্রাণ হলে 'হ' কারে পরিণত হয়েছে। যেমন— মুহ<মুখ।

৭) ঋ, র, ষ ধ্বণির পরবর্তী দন্ত্যধ্বনি (ত, থ, দ, ধ, ন) পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধণ্যধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) রূপ লাভ করেছে। যেমন— কট<কৃত।

৮) পদের মধ্যে অবস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জণের বিষমধ্বনিগুলি সমধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন— ভত্ত<ভক্ত।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) মধ্যভারতীয় আর্যে 'আ'-কারান্ত, 'ই'-কারান্ত ও 'উ'-কারান্ত শব্দ ছাড়া বাঁকি সব শব্দের রূপ 'অ'-কারান্ত শব্দের মত হয়। যেমন— 'নর'।

২) মধ্যভারতীয় আর্যে দ্বিবচন লোপ পেয়ে শব্দরূপে শুধু একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ থাকে।

৩) প্রাচীনভারতীয় আর্যে বিশেষ্য ও সর্বনামে শব্দরূপ পৃথক হত, মধ্যভারতীয় আর্যে কোথাও কোথাও বিশেষ্যের শব্দরূপ সর্বনামের শব্দরূপের মত হতে দেখা যায়।

৪) প্রাচীনভারতীয় আর্যে বহুবচনে প্রায়ই প্রথমা ও দ্বিতীয়ায় স্বরান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে পৃথক ছিল। যেমন— 'নর' শব্দের প্রথমার রূপ 'নরাঃ' এবং দ্বিতীয়ায় রূপ ছিল 'নরান্'; মধ্যভারতীয় আর্যে এই পার্থক্য লোপ পায়।

৫) প্রাচীনভারতীয় আর্যে ক্রিয়ারূপে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ এই দুই প্রকারভেদ ছিল। মধ্যভারতীয় আর্যে আত্মনেপদ প্রায় লোপ পায়, সর্বক্ষেত্রেই প্রায় পরস্মৈপদের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

৬) প্রাচীনভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার ধাতু **ভবাদি**, দ্বিভাদি প্রভৃতি গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যে সাধারণত সব ধাতুর রূপ **ভবাদি** গণের মত ধাতু হয়ে যায়।

৭) প্রাচীনভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার ভাব ছিল পাঁচটি— নির্দেশক, অনুজ্ঞা বা লোট, অভিপ্রায়, নিবন্ধ ও সম্ভাবক বা বিধিলিঙ্। মধ্যভারতীয় আর্যে এগুলির মধ্যে অভিপ্রায় ও নিবন্ধ ভাব লোপ পায়। প্রাকৃতে শুধু নির্দেশক, অনুজ্ঞা ও সম্ভাবক ভাব থাকে।

৮) প্রাচীনভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার কাল ছিল পাঁচটি— লট্, লঙ্, লৃট্, লিট্ এবং লুঙ্। এদের মধ্যে লঙ্, লুঙ্ ও লিট্ ছিল অতীতকালের প্রকারভেদ। মধ্যভারতীয় আর্যে এই তিনপ্রকার অতীতের মধ্যে লিট্ একেবারে লোপ পায়, আর লঙ্ ও লুঙ্ মিলে একটি রূপ লাভ করে।

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য:

প্রাচীনভারতীয় আর্যে বাক্যের পদবিন্যাসে বাঁধাধরা নিয়মের অপরিহার্যতা ছিলনা, কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যে অনেক বিভক্তি চিহ্ন লোপ পায় ফলে বাক্যের মধ্যে শব্দের নির্দিষ্ট স্থানে শব্দের অবস্থানের উপর বাক্যে তাদের ভূমিকা ও পদ পরিচয় অনেকখানি নির্ভর করে। তাই বাক্যের পদবিন্যাস ক্রমের নিয়মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এখানে বিভক্তি লোপ পাওয়ার ফলে বিভক্তির অর্থে কিছু স্বতন্ত্র শব্দ ও প্রত্যয়ের ব্যবহারের প্রচলনের পাশাপাশি অনুসর্গেরও প্রচলন হয়।

ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য:

প্রাচীনভারতীয় আর্যে ছন্দ অক্ষরমূলক হলেও মধ্যভারতীয় আর্যে ছন্দ হয়ে যায় মাত্রামূলক। ফলে ছন্দের বিন্যাস অক্ষরের সংখ্যার উপরে নয়, অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাপ বা মাত্রার উপর নির্ভর করতে হয়। কবিতার চরণ বা পঙ্‌ক্তিগুলি প্রথমে বিষমমাত্রিক থাকলেও সমমাত্রিক দ্বিবিধ চরণে পরিণত হত। এই সময় থেকেই অন্ত্যানুপ্রাস বা পঙ্‌ক্তির চরণের শেষে মিল রচনা শুরু হয়।

ধ্বনি পরিবর্তন

মানুষে মানুষে ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। নদীর স্রোতের মত এই ভাষা অখণ্ড গতিতে চলে এবং নিয়ত গতিপথ বদলাতে চেষ্টা করে। তাই ভাষা পরিবর্তণশীল। ভাষার পরিবর্তণ দুইভাবে হয়— ধ্বনিগত ও শব্দগত। যখন ভাষার উচ্চারণগত পরিবর্তণ সূচিত হয় তখন সেই পরিবর্তণকে ধ্বনিগত পরিবর্তণ বলে। বিভিন্ন কারনে ভাষার ধ্বনি পরিবর্তণ হয়। এই কারনগুলি হল—

ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু:

কোন একটা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতি সেই জাতির বসবাসস্থানের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্তিত হয়। তাই কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যেখানকার ভূ-প্রকৃতি রুক্ষ ও কঠোর সেখানকার ভাষায় কর্কশতা ও কঠোরতা বেশি থাকে। আর যেখানকার ভূ-প্রকৃতি বর্ষাস্নিগ্ধ কোমল সেখানকার ভাষায় কোমলতা ও মাধূর্য বেশি। একারনেই জার্মান ও ইংরেজি ভাষা অপেক্ষাকৃত কর্কশ আর ফরাসি ও ইতালিয় ভাষা অপেক্ষাকৃত মধুর। তবে ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু সব সময় ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। কারন দেখা যায় দিল্লি-আলিগড়-লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের রুক্ষ-শুস্ক প্রকৃতিতে উর্দূ ভাষার মত মাধূর্য পূর্ণ ভাষার বিকাশ ঘটেছে।

অন্যজাতির ভাষার প্রভাব:

একটি জাতির লোক দীর্ঘদিন অন্য জাতির শাসনাধীন থাকলে শাসক জাতির ভাষার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তার ভাষার উপর পড়ে। তাই দেখা যায় খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলীম আক্রমনের পর আরবী, ফার্সি ভাষার প্রভাব যেমন বাংলা ভাষার উপর পড়েছে, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আক্রমণের পর ইংরেজি ভাষার প্রভাব বাংলার উপর পড়েছে। এরফলে অনেক ক্ষেত্রে ধ্বনিগত প্রভাবও সূচিত হয়েছে।

জিহ্বার জড়তা বা উচ্চারণের ত্রুটি:

ভাষা ব্যবহার ও ভাষা সঞ্চালনে দু'টি পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়— বক্তা পক্ষ ও শ্রোতা পক্ষ। বক্তা ভাষা উচ্চারণ করে এবং শ্রোতা তা শ্রবণ করে। যদি বক্তার জিহ্বায় জড়তা থাকে বা উচ্চারণে ত্রুটি থাকে তাহলে ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ হয়। অনেক সময় এই বিকৃত উচ্চারণই প্রচলিত হয়ে ধ্বনির পরিবর্তণ ঘটে। যেমন— লক্‌খি<লক্ষ্মী।

শ্রবণ ও বোধের ত্রুটি:

বক্তা সঠিক উচ্চারণ করলেও অনেক সময় শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রীয়ে ত্রুটি থাকার ফলে বা বোধের ত্রুটি থাকার ফলে তিনি তা ঠিকমত হৃদয়াঙ্গম করতে পারেন না। ফলে ধ্বনির বিকৃতি ঘটে এবং ধ্বনি পরিবর্তণ সাধিত হয়।

আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা:

অনেক সময় বক্তার উচ্চারণের সময় আরামপ্রিয়তা ও অনধাবনতা কাজ করে। ফলে তিনি শব্দের অন্তর্গত একটি ধ্বনি উচ্চারণ করার পর অন্যধ্বনি উচ্চারণ করার আগে নতুন কোন ধ্বনি নিয়ে চলে আসেন। ফলে শব্দের মধ্যে ধ্বনি পরিবর্তণ ঘটে। যেমন— বান্দর<বানর।

সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব:

পাশাপাশি দু'টি ধ্বনি থাকলে অনেক সময় এক ধ্বনির প্রভাবে অপর ধ্বনি প্রভাবিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রভাবের ফলেই নতুন ধ্বনির আগমন ঘটে এবং ধ্বনি পরিবর্তণ হয়। যেমন— পদ্দ<পদ্ম।

মূলতঃ উপরিউক্ত কারনগুলির জন্যেই ভাষার শব্দ মধ্যস্থিত ধ্বনিগুলির পরিবর্তণ হয়। এই সমস্ত কারনে শব্দের যে ধ্বনি পরিবর্তণ ঘটে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা সেই পরিবর্তণকে প্রধাণ চারটি সূত্রে বিভক্ত করেছেন— ১) ধ্বনির আগম, ২) ধ্বনির লোপ, ৩) ধ্বনির রূপান্তর এবং ৪) ধ্বনির স্থানান্তর ও বিপর্যাস।

ধ্বনির আগম:

যখন শব্দের মধ্যে নতুন ধ্বনির আগমন ঘটে তখন তাকে ধ্বনির আগম বলে। ধ্বনির আগম দু'ভাবে ঘটতে পারে— স্বরধ্বনির আগম ও ব্যঞ্জণধ্বনির আগম। তাই ধ্বনির আগম দুই প্রকার— স্বরাগম ও ব্যঞ্জণাগম।

ধ্বনির আদিতে, মধ্যে ও শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে জন্য স্বরাগম তিন প্রকার— ১) আদি স্বরাগম (ইস্কুল<স্কুল), ২) মধ্য স্বরাগম (ভকতি<ভক্তি)— একে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ ও বলা হয়, এবং ৩) অন্ত্য স্বরাগম (বেঞ্চি<বেঞ্চ)। এছাড়াও অপিনিহিতির ক্ষেত্রেও স্বরধ্বনির আগমন ঘটে।

অনুরূপভাবে ব্যঞ্জণাগম ও তিনপ্রকার— ১) আদি ব্যঞ্জণাগম (রুজু<উজু<ঋজু), ২) মধ্য ব্যঞ্জণাগম (শিয়াল<শিআল<শৃগাল) এবং ৩) অন্ত্য ব্যঞ্জণাগম (খোকন<খোকা)।

ধ্বনিলোপ:

শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে ধ্বনি লোপ পেলে তাকে ধ্বনিলোপ বলে। ধ্বনির আগমের মত ধ্বনি লোপও দুই প্রকার— স্বরলোপ ও ব্যঞ্জণলোপ। স্বরলোপের আবার তিনটি ভাগ— ১) আদি স্বরলোপ (লাউ<অলাবু), ২) মধ্য স্বরলোপ (গাম্ছা<গামোছা) এবং ৩) অন্ত্য স্বরলোপ (রাশ<রাশি)। আর ব্যঞ্জনলোপের উদাহরণ হল— ফলার<ফলাহার। এছাড়াও সমাক্ষর লোপ (বড়দা<বড়দাদা) এবং সমবর্ণলোপও ব্যঞ্জণলোপের মধ্যে পড়ে।

ধ্বনির রূপান্তর:

ধ্বনি যখন লোপ পায়না বা নতুন কোন ধ্বনির আগমন ঘটেনা তখন এক ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্যধ্বনির রূপ লাভ করে। ধ্বনির রূপান্তর ও দুইভাবে হয়— স্বরধ্বনিগত রূপান্তর ও ব্যঞ্জণধ্বনিগত রূপান্তর।

স্বরধ্বনিগত রূপান্তরের মধ্যে অভিশ্রুতি (করে<কইর‍্যা<করিয়া), স্বরসঙ্গতি (প্রগত- পূজো<পূজা, পরাগত- দিশি<দেশি, অন্যোন্য- বিলিতি<বিলাতি) প্রভৃতি পড়ে। আর ব্যঞ্জণধ্বনিগত রূপান্তরের মধ্যে ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন (ধাম<ধম্ম<ধর্ম), সমীভবন (প্রগত- পদ্দ<পদ্ম, পরাগত- ধম্ম<ধর্ম, অন্যোন্য উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস), বিষমিভবন (নাল<লাল), ঘোষীভবন (ছোড়দি<ছোটদিদি), মহাপ্রাণীভবন (পুঁথি<পুস্তক), অল্পপ্রাণীভবন (বাগ<বাঘ), নাসিক্যীভবন (পাঁচ<পঞ্চ), স্বতোনাসিক্যীভবন (পেঁচা<পেঁচক), মূর্ধণ্যীভবন (বিকট<বিকৃতি),

স্বতমূর্ধণ্যীভবন (পড়ে<পড়ই<পততি), বিমূর্ধীভবন (প্রান<প্রাণ), তালব্যীভবন (বিষ<বিশ), উষ্মীভবন, সকারীভবন, অকারীভবন, সংকোচন, প্রসারণ প্রভৃতি পড়ে।

ধ্বনির স্থানান্তর:

শব্দ মধ্যস্থিত কাছাকাছি অবস্থিত বা সংযুক্ত দু'টি ধ্বনির মধ্যে স্থান বিনিময় করলে একে বিপর্যাস বলে। যেমন— বাস্ক<বাক্স, মুটুক<মুকুট। অনেকে অপিনিহিতিকেও স্বরধ্বনির স্থানান্তরের দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন।

শব্দার্থ পরিবর্তন

ভাব ও অর্থ নিয়ে ভাষার অস্তিত্ব। কোন ভাষার মূলে থাকে ধ্বনি বা বর্ণ। আর ধ্বনি বা বর্ণ মিলে তৈরি হয় শব্দ। প্রত্যেক ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, শব্দের ধ্বনি, শব্দের রূপ, শব্দের অর্থ প্রভৃতির সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে। শব্দের অর্থকে নিয়ে যে বিচিত্র শ্রেণীবদ্ধ আলোচনা তাকে শব্দার্থ তত্ত্ব বলে।

শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাব ও অর্থ যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের নানা কারন আছে। এই কারনগুলি হল—

ভৌগোলিক কারণ:

একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে প্রায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে জন্য ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটলে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন— 'অভিমান' শব্দটি বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল প্রকৃতিতে যে অর্থ বহন করে তাতে কোমল অনুভূতি 'স্নেহ মিশ্রিত অনুযোগ'-এর ভাব আছে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের শুস্ক-কঠিন-কঠোর প্রকৃতিতে 'অভিমান' শব্দের অর্থে সেই কোমলতা নেই, হিন্দিতে সেখানে 'অভিমান' মানে 'অহংকার' বা 'অহংভাব'।

ঐতিহাসিক কারণ:

মানুষের জীবনধারার পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়। যেমন আদিমকালে পুরুষেরা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যেত; সেই জন্য তখন বিবাহ কথাটি 'বিশেষরূপে বহন করা' অর্থে প্রচলিত হয়। পরে সমাজে এই আদিম বর্বর বিবাহ বিধি অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং বর্তমানে বিবাহ কথাটি অর্থ 'পরিণয় সূত্র'।

বাক্যে অলংকারের ব্যবহার:

ভাষাকে সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য প্রায় সকল ভাষাতেই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্যে অলংকারের প্রয়োগ করা হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন— 'মাথা' শরীরের একটি অংশ; শরীরের মধ্যে এই অংশটি মুখ্য বলে অনেক সময় আমরা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে মাথা শব্দটি ব্যবহার করি। যেমন— তিনি গ্রামের মাথা। এছাড়াও শব্দটি আরও নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন— অঙ্কে তার খুব মাথা, সে গাছের মাথায় উঠল, কাজের মাথা খেয়েছ ইত্যাদি।

সুভাষণ:

আমরা কথার মধ্যে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করি যার মধ্যে দিয়ে শিষ্টাচার, শোভনতা, সম্ভ্রম এবং মর্যাদা প্রকাশ পায়। এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারকে সুভাষণ বলে। যেমন- রাধুনীকে বলা হয় 'ঠাকুর', কানাছেলেকে 'কমললোচন', মারা যাওয়াকে 'গঙ্গা লাভ করা' ইত্যাদি।

ভাষা বিণয় প্রকাশ:

অনেক সময় বিণয় বশতঃ শব্দের মূল অর্থের পরিবর্তন করা হয়। যেমন অনেকেই নিজের অট্টালিকাকে বলেন 'কুটির', অথচ কুটির শব্দের অর্থ 'কুঁড়েঘর'।

ভাবাবেগের কারণ:

অনেক সময় আবেগ বশত আমরা শব্দের অর্থকে পরিবর্তিত করি বা শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি, যার ফলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন 'সুতরাং' শব্দটির মূল অর্থ 'আরো ভালো', কিন্তু আমরা না জেনে অতএব অর্থে ব্যবহার করি।

দেশ বা ব্যক্তির নামবাবদ নতুন শব্দের আগমন:

দেশ বা ব্যক্তির বিশেষ দানকে অবলম্বন করে অনেকসময় তার নাম সর্বজনীনতা লাভ করে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন 'কর্ণ' মহাভারতের একটি চরিত্র এবং তিনি দাতারূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন— এ থেকে 'দাতা' অর্থে কর্ণ শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। আবার বেনারসে প্রস্তুত এক বিশেষ ধরণের শাড়িকে 'বেনারসী' বলা হত, কিন্তু এইরূপ শাড়ি এখন যেখানেই প্রস্তুত হোক না কেন তাকে বেনারসী বলে। এইরূপ 'চিনি' বা 'মিশ্রি', 'পেপার', 'কালি' প্রভৃতি শব্দগুলিও অর্থ পরিবর্তন করেছে।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়াও ব্যঙ্গক্তি, তৎসম শব্দের তদ্ভব রূপ, ধ্বনি পরিবর্তন, শব্দার্থ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা, একই শব্দের ভিন্ন অর্থে ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে শব্দার্থ পরিবর্তনের যে ধারাগুলির সৃষ্টি হয়েছে ড. সুকুমার সেন তাদের মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন— শব্দার্থের বিস্তার বা প্রসার, শব্দার্থের সংকোচন এবং শব্দার্থের সংক্রম বা সংশ্লেষ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা শব্দার্থের উৎকর্ষ বা উন্নতি এবং শব্দাথের্র অপকর্ষ বা অবনতি নামে আরও দু'টি ধারা এর সঙ্গে যোগ করেছেন।

শব্দার্থের বিস্তার বা সম্প্রসারণ:

কোন কারণে শব্দ তার বূৎপতিগত অর্থ ছাড়াও যদি আরও ব্যপকতর অর্থে প্রচলিত হয় তবে তাকে শব্দার্থের বিস্তার বলে। যেমন— 'গাঙ' শব্দটির মূল অর্থ গঙ্গানদী; প্রথমে গাঙ বলতে গঙ্গানদীকেই বোঝানো হত, কিন্তু পরবর্তীকালে গাঙ শব্দটির অর্থ গঙ্গানদীকে অতিক্রম করে আরও বিস্তারলাভ করে যে কোন নদী হয়েছে। অনুরূপভাবে 'ইন্দ্র' দেবতাদের রাজা অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে শব্দটি বিস্তারলাভ করে ব্যপকতর অর্থে প্রচলিত হয়েছে। যেমন— 'রবীন্দ্র', 'জ্ঞানেন্দ্র' প্রভৃতি। এছাড়াও 'চিনি' (প্রথমে ছিল চিনদেশ থেকে আনা মিস্টিচূর্ণ), 'বেনারসী' (প্রথমে ছিল বেনারসে প্রস্তুত এক বিশেষ ধরণের শাড়ি) শব্দগুলিরও অর্থবিস্তার ঘটেছে। আরও কিছু উদাহরণ হল—

শব্দ	মূলঅর্থ	সম্প্রসারিত অর্থ
তেল	যা তিল থেকে জাত	যে কোন পিচ্ছিল তরল পদার্থ
কালি	কালো রং বিশেষ	লেখার কাজে ব্যবহৃত যে কোন তরল
পরশ্বঃ	আগামীকালের পরদিন	আগামী কালের পরদিন এবং গতকালের পূর্বদিন

শব্দার্থে সংকোচন:

শব্দ অনেক সময় তার মূল ব্যপকতর অর্থ পরিত্যাগ করে একটি বিশেষ সংকুচিত অর্থে প্রচলিত হয়। যেমন— 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'যে কোন খাদ্য', কিন্তু অর্থ সংকোচনের ফলে বর্তমানে তা হয়েছে 'ভাত'। অনুরূপ 'প্রদীপ' (মূল অর্থ দীপ অথবা আলো), 'সন্দেশ' (মূল অর্থ চিঠি) শব্দেরও অর্থসংকোচন ঘটেছে। আরও কিছু উদাহরণ হল—

শব্দ	মূলঅর্থ	সংকোচিত অর্থ
পীতাম্বর	হলুদবস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি	শ্রীকৃষ্ণ

মৃগ	যে কোন পশু	হরিণ
শ্বশুর	যিনি শীঘ্র খান	স্বামী বা স্ত্রীর পিতা।

শব্দার্থের সংশ্লেষ বা সংক্রম:

শব্দের অর্থ বারবার প্রসারিত বা সংকোচিত হবার ফলে একসময় এমন অর্থ দাঁড়িয়ে যায় যার সাথে মূল অর্থের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। এরূপ পরিবর্তনকে শব্দার্থের সংশ্লেষ বা সংক্রম বলে। যেমন 'পাষণ্ড' শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'ধর্ম সম্প্রদায়', পরবর্তীকালে হয়েছিল বিরুদ্ধ ধর্মের উপাসক, কিন্তু এখন হয়েছে 'ধর্মজ্ঞানহীন নির্মম, নিষ্ঠুর ব্যক্তি'। অনুরূপভাবে 'দিব্য' (মূল অর্থ জুয়া খেলার পণ), 'ঘড়ি' (মূল অর্থ জল রাখার ছোট ঘড়া) প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়েছে। শব্দার্থ সংকোচের আরও উদাহরণ হল—

শব্দ	**মূলঅর্থ**	**সংশ্লেষিত অর্থ**
কৃপণ	কৃপার পাত্র	ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি
ঘর্ম	গরম	ঘাম বা স্বেদ
পাত্র	পান করবার আধার	বর।

শব্দার্থের উৎকর্ষ:

শব্দ যখন তার মূল অর্থ পরিত্যাগ করে আর ও উন্নততর অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তকে শব্দার্থের উৎকর্ষ বলে। যেমন 'মন্দির' শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'গৃহ' কিন্তু আধুনিক অর্থ হল 'দেবালয়'। শব্দার্থের উৎকর্ষের আরও উদাহরণ হল—

শব্দ	**মূলঅর্থ**	**উৎকর্ষতর অর্থ**
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন বিশেষ
হরিণ	হরণকারী বা চোর	পশু বিশেষ
পঙ্কজ	পঙ্কে জাত	পদ্মফুল।

শব্দার্থে অপকর্ষ বা অবণতি:

শব্দ যখন তার মূল অর্থ পরিত্যাগ করে নিম্নতর অর্থে প্রযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন তাঁকে শব্দার্থের অপকর্ষ বা অবণতি বলে। যেমন— 'মহাজন' শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'মহাপুরুষ', কিন্তু এর অর্থের অপকর্ষ হয়ে এখন হয়েছে 'সুদের কারবারি'। শব্দের অপকর্ষের আরও উদাহরণ হল—

শব্দ	**মূলঅর্থ**	**অপকর্ষতর অর্থ**
ঝি	মেয়ে	দাসী
জ্যাঠামি	জ্যেষ্ঠের মত ব্যবহার	পাকামি
ইতর	অন্য	নীচ।

বাংলা উপভাষা

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম প্রধাণ মাধ্যম হল ভাষা। অনেক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের আলোচনা থেকে ভাষা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে তা হচ্ছে— ভাষা হল মানুষের বাক্‌যন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত বহুজনবোধ্য অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি, যা কোন বিশেষ জনসমাজে প্রচলিত থেকে মানুষে মানুষে ভাব প্রকাশের মাধ্যমের কাজ করে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ভাষা হল কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপ যার দ্বারা একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। যে জনসমাজের লোকেরা একই ধরণের ভাষায় নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে তাদের ভাষা সম্প্রদায় বলে। একটি ভাষা সম্প্রদায় যত বড় হয় ততই তার মধ্যে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে একই ভাষা সম্প্রদায়ের অনেক ছোট ছোট ভাষার ছাঁদ গড়ে ওঠে। একেই উপভাষা বলে।

তাই বলা হয় ভাষা হল মানুষে মানুষে ভাব বিনিময়ের নিরাকার ব্যবস্থা, আর উপভাষা হল সেই ব্যবস্থারই প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক রূপ। উপভাষার দু'টি রূপ দেখা যায়— কথ্য ও লেখ্য। আমরা বাংলা উপভাষা আলোচনা করতে গিয়ে বাংলা কথ্য উপভাষার কথাই আলোচনা করব।

বাংলা ভাষা হল পৃথিবীর মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ভাষা। বিশ্বের অনেক জায়গায় বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকলেও মূলত ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা রাজ্য, অসমের কিছু অংশ, ঝাড়খন্ডের কিছু অংশ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এইভাষা প্রধাণভাষা হিসাবে প্রচলিত। স্বাভাবিকভাবেই এত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রচলিত থাকায় মূল বাংলা ভাষার মধ্যে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এর উপর ভিত্তি করে বাংলা উপভাষাকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়—

রাঢ়ী উপভাষা:

মধ্য পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিনবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, কলকাতা ও বাঁকুড়ার কিছু অংশে ও মেদিনীপুরের কিছু অংশে প্রচলিত।

বঙ্গালী উপভাষা:

পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি ও চট্ট গ্রামে প্রচলিত।

বরেন্দ্রী উপভাষা:

উত্তরবঙ্গের মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, বাংলাদেশের রাজসাহী এবং পাবনায় প্রচলিত।

ঝাড়খন্ডী উপভাষা:

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কিছু অংশ এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রচলিত।

কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা:

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, অসমের কাছাড়, গোয়ালপাড়া, ধুবরী এবং ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উপভাষাগুলি আঞ্চলিকস্তরে প্রচলিত থাকলেও স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত প্রভৃতি স্থানের সর্বত্র একটি মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা হয়, যা উপভাষাগুলির মধ্য থেকেই উঠে আসে। এই উপভাষাটিকেই কেন্দ্রীয় উপভাষা বলে। বাংলা পাঁচটি উপভাষার মধ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালতের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মানুষজন রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলেন জন্য রাঢ়ী হল বাংলার কেন্দ্রীয় উপভাষা।

বাংলা উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

রাঢ়ী উপভাষা:

ধ্বনিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) রাঢ়ী উপভাষায় 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। যেমন— ওতি<অতি, মোধু<মধু।

২) রাঢ়ীতে অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। যেমন— শাগ<শাক।

৩) রাঢ়ীতে অভিশ্রুতির বহুল প্রয়োগ থাকে। যেমন— করে<কইর‍্যা<করিয়া।

৪) রাঢ়ীতে স্বরসঙ্গতির বহুল প্রয়োগ থাকে। যেমন— দিশি<দেশি।

৫) রাঢ়ীতে শব্দ মধ্যস্থিত ব্যঞ্জণধ্বনি অনেক সময় লোপ পেয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে। যেমন— চাঁদ<চন্দ্র।

৬) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনি হিসাবে উচ্চারিত হয়। যেমন— বাগ<বাঘ, দুদ<দুধ।

৭) 'ল' ধ্বনি কোথাও 'ন' ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— নুন<লবন, নুচি<লুচি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) রাঢ়ী উপভাষায় মুখ্যকর্মে শূণ্যবিভক্তি এবং গৌণকর্মে 'কে' বিভক্তি হয়। যেমন— মা ছেলেকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

২) অধিকরণ কারকে 'এ', 'তে', 'য়'—বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— সে বাড়িতে গেছে।

৩) অতীতকালে উত্তম পুরুষে ক্রিয়ার সাথে '-লুম', '-লাম', '-লেম' এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৪) কতৃকারক ছাড়া অন্যান্য কারকে 'দের' বিভক্তি যুক্ত হয়।

৫) মূলধাতুর সাথে 'আছ' ধাতু যোগ করে সেই ধাতুর সাথে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান অতীত ও ঘটমান বর্তমানের রূপ গঠন করা হয়। যেমন— আমি করছি (কর্+ছি), সে করেছিল (করে+ছিল)।

৬)মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপের সাথে 'আছ' ধাতু যোগ করে সেই ধাতুর সাথে ক্রিয়ার কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীতের ক্রিয়ারূপ রচনা করা হয়। যেমন— সে করেছে (করে+ছে), সে করেছিল (করে+ছিল)।

৭) সদ্য অতীতকালেও প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-ল'। যেমন— সে গেল।

বরেন্দ্রী উপভাষা:

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) বরেন্দ্রী উপভাষায় 'এ' ধ্বনি 'অ্যা'-মত উচ্চারিত হয়। যেমন— অ্যাক<এক, ব্যাটা<বেটা।

২) 'র' ধ্বনি 'অ' এবং 'অ' ধ্বনি 'র'-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন— অস<রস, রাম<আম।

৩) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি শুধু শব্দের আদিতে বজায় থাকে, কিন্তু শব্দের মধ্যে ও অন্তে প্রায়ই অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন— বাগ<বাঘ।

৪) 'ড়' ও 'ঢ়'-এর প্রয়োগ এই উপভাষায় রক্ষিত থাকে।

৫) বরেন্দ্রীতে 'জ' (J) প্রায় 'জ' (Z) রূপে উচ্চারিত হয়।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) অতীতকালে উত্তম পুরুষে '-লাম' যুক্ত হয়। যেমন— আমি করলাম।

২) অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তির জায়গায় 'ত' বিভক্তি হয়। যেমন— বাবা বাড়িতে আছে।

৩) গৌণকর্মে 'ক' বিভক্তি হয়।

৪) অন্তিম ব্যঞ্জণ অনেক সময় দ্বিত হয়।

কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা:

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) 'ল' ধ্বনি 'ন'-এর মতো উচ্চারিত হয় এবং 'ন' ধ্বনি 'ল'-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন— নাল<লাল।

২) 'র' ধ্বনি 'অ'-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন— অস<রস।

৩) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি শুধু শব্দের আদিতে বজায় থাকে, মধ্য ও অন্ত্যে পরিবর্তিত হয়। যেমন— সমজি<সমঝি<সমঝা।

৪) 'ও' ধ্বনি কখনো 'উ'-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন— কুন<কোন।

৫) কামরূপিতে শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যে শ্বাসাঘাত পড়ে।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) সাধারণ অতীতে উত্তমপুরুষে '-নু' এবং প্রথম পুরুষে '-ইল' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— সেবা কন্নু, সে কহিল।

২) উত্তমপুরুষে একবচনের সর্বনাম 'মুই', 'হাম' হয়।

৩) মধ্যমপুরুষের সর্বক্ষেত্রে 'তুই' সর্বনাম ব্যবহার করা হয়।

৪) সম্বন্ধকারকে 'র'-এর পাশাপাশি 'ক' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— বাপক (বাপের)।

৫) গৌণকর্মে 'ক' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— হামাক (আমাকে)।

বাংলা শব্দভাণ্ডার

কোন ভাষার সার্থকতা নির্ভর করে তার প্রকাশ ক্ষমতার উপর। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশ ক্ষমতার মূল আধার হল শব্দ। একটি ভাষায় যতগুলি শব্দ থাকে, সবগুলি নিয়েই তৈরি হয় সেই সেই ভাষার শব্দভাণ্ডার। কোন ভাষার শব্দভাণ্ডারে যত বেশি শব্দ থাকে সেই ভাষাকে তত সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে ধরা হয়।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা বর্তমানে পৃথিবীর একটি সমৃদ্ধতম ভাষা। এই ভাষায় প্রচুর শব্দ আছে। এই শব্দগুলিই বাংলা শব্দভাণ্ডারের উপাদান। একটি ভাষায় তিনভাবে শব্দ গৃহীত হয়— ১) উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, ২) অন্যভাষা থেকে গ্রহণ করা এবং ৩) নতুনভাবে সৃষ্টি করা। বাংলা ভাষাতেও এই তিনভাবে শব্দ এসেছে। তাই বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রধাণ প্রধাণ উপাদানগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়— ১) মৌলিক শব্দ, ২) আগুন্তক শব্দ বা কৃতঋণ শব্দ এবং ৩) মিশ্র বা সংকর শব্দ।

মৌলিক শব্দ:

প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তনের নানা স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। তাই প্রাচীনভারতীয় আর্যের বিশেষত সংস্কৃতের অনেক শব্দই সরাসরি বা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে। এই শব্দগুলিকেই মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দ তিন প্রকার — ক) তৎসম শব্দ, খ) অর্ধ-তৎসম শব্দ এবং গ) তদ্ভব শব্দ।

তৎসম শব্দ:

'তৎ' কথাটির অর্থ 'তার' অর্থাৎ সংস্কৃতের এবং 'সম' কথাটির অর্থ 'সমান'। সুতরাং তৎসম কথার অর্থ তার অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। তাই সংস্কৃত থেকে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলিকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন— গৃহ, অন্ন, সহ্য, আকাশ, পৃথিবী, প্রভাত, সন্ধ্যা, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ:

যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে গৃহীত হবার সময় কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলিকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন— কেষ্ট, ছেরাদ্দ, রাত্তির, মিত্তির, ছিরি, বচ্ছর, নেমতন্ন প্রভৃতি।

তদ্ভব শব্দ:

'তদ্ভব' কথাটি ভাঙলে হয় 'তদ্-ভব' অর্থৎ তার (সংস্কৃতের) থেকে উদ্ভব। যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে নানারূপ পরিবর্তনের পর বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন ভাত

(ভাত<ভত্ত<ভক্ত), মাছ (মাছ<মচ্ছ<মৎস), আজ (আজ<অজ্জ<অদ্য), মাটি (মাটি<মট্টিয়া<মৃত্তিকা), ঝি (ঝি<ঝিঅ<দুহিতা) প্রভৃতি।

আগুন্তক বা কৃতঋণ শব্দ:

প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতির লোক বাংলার ভূখন্ডে পদার্পন করেছে। এদের মধ্যে অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। আর্যরা আসার বহু পূর্ব থেকেই অনার্য জাতির লোকেরা একানে বসবাস করত। নব্যভারতীয় আর্যভাষার যুগে ভারতবর্ষেই নানা প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই অন্যজাতির লোকজনদের ভাষা থেকে, অনার্য জাতির ভাষা থেকে এবং অন্য প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনেক শব্দই বাংলা ভাষায় এসেছে। এগুলিকেই কৃত ঋণ বা আগুন্তক শব্দ বলে। এই ধরণের শব্দকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়— ক) দেশি শব্দ, ২) বিদেশি শব্দ এবং ৩) প্রাদেশিক শব্দ।

দেশি শব্দ:

আর্যরা আসার পূর্বে এদেশে যে অনার্য জাতির লোকজনেরা বাস করত, তাদের ভাষা থেকে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলিকেই দেশি শব্দ বলে। যেমন ডিঙ্গি, ঝাটা, ঝিঙা, চিল, চিংড়ি, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি।

বিদেশি শব্দ:

প্রাচীনকাল থেকেই যে সকল বিদেশি জাতি এদেশে এসেছে তাদের ভাষা থেকে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সে গুলিকেই বিদেশি শব্দ বলে। বাংলায় মূলত বিদেশি শব্দ এসেছে দু'ভাবে— ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের পর আরবি, ফারসি, তুর্কি প্রভৃতি ভাষা থেকে এবং সপ্তদশ শতকে ইউরোপিয়দের আগমনের পর। এর মধ্যে ইংরেজরা এখানে রাজত্ব করায় ইংরেজি শব্দ থেকেই বেশি শব্দ এসেছে। এছাড়া পর্তূগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি ভাষা থেকেও অনেক শব্দ এসেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় আরও অনেক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় শব্দ গৃহীত হচ্ছে। বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দগুলি হল—

তুর্কি শব্দ: আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, তাবু, বাবা, বেগম, বচকা, কুলি প্রভৃতি।

আরবি শব্দ: আইন, আক্কেল, কেচ্চা, কিতাব, তাজ্জব, বিদায় প্রভৃতি।

ফারসি শব্দ: আন্দাজ, খরচ, কম, বেশি, শহর, জাহাজ, রেশম, খেয়াল, পেয়ালা প্রভৃতি।

পোর্তূগীজ শব্দ: আতা, আনারস, ফিতা, আলকাতরা, আলমারি, জানালা, পেয়ারা, পেপে পেরেক প্রভৃতি।

ফরাসি শব্দ: বিস্কুট, কার্তূজ, রেস্তরা, আঁতাত, কুপন প্রভৃতি।

ওলন্দাজ শব্দ: হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ প্রভৃতি।

ইংরেজি শব্দ: স্টেশন, চেয়ার টেবিল, ব্রেঞ্চি, টেলিফোন, মেশিন, সিনেমা, ভোট, বাস, ট্রাম, ট্রেন, ক্রিকেট, ফুটবল, বল প্রভৃতি।

জার্মান শব্দ: কাইজার, নাৎসি প্রভৃতি।

ইতালিয় শব্দ: কোম্পানি, গেজেট প্রভৃতি।

রুশ শব্দ: সোভিয়েট, বলশেভিক, ভটকা প্রভৃতি।

স্পেনিয় শব্দ: কমরেড।

চিনা শব্দ: চা, চিনি।

বর্মি শব্দ: লুঙ্গি, ঘুঘনি।

জাপানি শব্দ: হারাকারি, কিন্ডারগার্টেন।

প্রাদেশিক শব্দ:

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে সকল শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলিকে প্রাদেশিক শব্দ হিসাবে ধরা হয়। যেমন হিন্দি থেকে কুত্তা, খতম, পানি, কাহিনি, খুন, বদলা, জলদি প্রভৃতি শব্দ; গুজরাটি থেকে হরতাল, খাদি প্রভৃতি, মারাঠি থেকে ধনি, পাঞ্জাবি থেকে চাহিদা, অসমিয়া থেকে ভাঙর, উড়িয়া থেকে গুন্ডী প্রভৃতি শব্দ এসেছে।

মিশ্র বা সংকর শব্দ:

বাংলায় দীর্ঘদিন একসঙ্গে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকায় এক ভাষার শব্দের সাথে অন্য ভাষার শব্দ বা উপসর্গ যুক্ত হয়ে হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। এগুলিকে মিশ্র বা সংকর শব্দ বলে। যেমন— মাস্টারমশাই। গাড়িওয়ালা, দোকানদার, ফিবছর, নিমরাজি, হেডপন্ডিত প্রভৃতি।

উপরিউক্ত উপাদানগুলি বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রধাণ প্রধাণ উপাদান হলেও বর্তমানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ উন্নত হ ওয়ায় ইন্টারনেট, SMS, প্রভৃতিতে শব্দ সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। আবার মানুষও বড়ো শব্দগুলিকে ছোট করে উচ্চারণ করছে। এগুলিকেও বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তভূক্ত করা হয়।